গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ - ৬ জানুয়ারি ২০২২ www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ৩ টাকা

সিপিএমের মতো তৃণমূল সরকারও স্বৈরাচারী ভূমিকা নিচ্ছে

২৬ ডিসেম্বর বীরভূমের সিউড়িতে রামকৃষ্ণ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত নাগরিক কনভেনশন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করল, ডেউচা-পাঁচামি এলাকায় জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়ের ছায়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের দুই শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে ও বিশিষ্ট নাগরিক বংশীধর দাসের সভাপতিত্বে এই কনভেনশন পরিচালিত হয়। মূল

ডেউচা পাঁচামি খনি প্রকল্প

প্রস্তাব পেশ করেন মার্শাল হেমব্রম। বক্তব্য রাখেন, শিক্ষক বাগাল মার্ডি, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বিজয়কৃষ্ণ দলুই, অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দীপক কুমার, বিসম্বর মুড়া প্রমুখ। এই নাগরিক কনভেনশন এবং আন্দোলনের সাথে সহমত জ্ঞাপন করে বার্তা পাঠায় সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন পর্বে গড়ে ওঠা 'শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ' ও 'নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ'। উভয় বার্তা পাঠ করেন শুভময় দে।

কনভেনশনের মূল প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বীরভূমের মহম্মদবাজার ব্লকের পাঁচামি এলাকায় প্রস্তাবিত কয়লা প্রকল্পকে কেন্দ্র করে পুলিশ-প্রশাসন এলাকাবাসীদের উপর যেভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনছে এই নাগরিক কনভেনশন তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ও তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

গণদাবীর বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫০ টাকা
বার্ষিক সডাক গ্রাহক মূল্য ১৬৫ টাকা

গণহত্যার ডাক দিলেও শাস্তি হয় না এটাই বিজেপির সুশাসন

"ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি হিন্দু মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয় ভারতবর্ষীয়দের পূর্ণপরিচয়।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী)।

হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতা লিখেছেন, "মোগলগণের গরিমা স্বামীজি শতমুখে বর্ণনা করিতেন।... আগ্রার সন্নিকটে সেকেন্দ্রার সেই গম্বুজবিহীন অনাচ্ছাদিত সমাধির পাশে বসিয়া আকবরের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজির কণ্ঠ যেন অশ্রু গদগদ হইয়া আসিত।" নিবেদিতা আরও লিখেছেন, শাহজাহান যেহেতু মুসলমান, সে জন্য এক শিষ্য তাঁকে বিদেশি বলায় বিবেকানন্দ তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। বিবেকানন্দ এমনকী একথাও বলেছেন— "এটা খুবই স্বাভাবিক যে একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খ্রিস্টান ও আমি নিজে মুসলমান হতে পারি"। ('স্বামীজিকে যেমন দেখেছি'— ভগিনী নিবেদিতা)

আজকের ভারতে এসে দাঁড়ালে কী বলতেন বিশ্বকবি? কী বলতেন বিবেকানন্দ? যখন দেখতেন আজ ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের মসনদে আসীন দলের ঘনিষ্ঠ হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারীরা 'হিন্দুধর্ম' রক্ষার অজুহাতে ভারতের সংখ্যালঘু মানুষের উপর গণহত্যা চালানোর ডাক দিচ্ছেন! অথচ কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী-নেতা থেকে শুরু করে পুলিশ পর্যন্ত ঠুঁটো হয়ে দেখছে! এরাই নাকি হিন্দু ধর্মের তথা দেশের ত্রাতা? কোনও ধর্ম বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ কি এ জিনিস মানতে পারেন? কোনও সভ্য দেশের সরকার এই হত্যার কারবারিদের মুক্ত অবস্থায় সমাজে ঘুরে বেড়াতে দিতে পারে?

উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে ধর্ম-সংসদের নামে এমনই ডাক দিয়েছেন স্বঘোষিত কিছু ধর্মগুরু। তাঁরা বলেছেন, তাঁদের প্রেরণায় ট্রেনিং নিয়ে ১০০ জন সেনা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২০ লক্ষ মানুষকে হত্যা

তিনের পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি খোলা সহ ১২ দফা দবিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের হুগলির চুঁচুড়ায় অবস্থান ও জেলাশাসককে স্মারকলিপি প্রদান। ২০ ডিসেম্বর। (খবর চারের পাতায়)

নিপীড়িত জনগণের পাশে থাকুন, বিপ্লবের সংগঠক হয়ে উঠুন

যুব সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে কমরেড প্রভাস ঘোষ

১১-১২ ডিসেম্বর ঘাটশিলায় অনুষ্ঠিত এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধিদের উদ্দেশে এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ নিচের বার্তাটি পাঠান।

সর্বপ্রথমে আমি, এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে আপনাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বিশাল দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে বহু বাধা অতিক্রম করে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, যুবসমাজ যে সব সমস্যার সম্মুখীন তা নিয়ে

আলোচনা করতে এবং দেশজোড়া যুব আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত কর্মসূচিগুলির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে।

নদীর জলে কাউকে ডুবে যেতে দেখলে, কে তাকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেয়? সকলেই জানেন, একমাত্র সাহসী যৌবনই তা করে। কোথাও জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা যখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এলাকাবাসীকে বিপন্ন করে তোলে, তখন যৌবনের অদম্য চেতনাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে রক্ষা করে। আবারও যখন বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানব জীবনের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়ে, তখনও কেবলমাত্র সাহসী যুবকরাই আক্রান্তদের উদ্ধারে উদ্যোগ নেয়।

একইভাবে, ইতিহাসের একটি বিশেষ স্তরে সমাজ যখন ক্রমবর্ধমান হারে গভীরতর সঙ্কটের মুখোমুখি হয় এবং পরিণামে খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবন যখন অশেষ জ্বলন্ত সমস্যায় আক্রান্ত হয়, সেই যন্ত্রণাময় পরিস্থিতি থেকে মানুষকে রক্ষা করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাদের? চিরদিনই এ দায়িত্ব পালন করে এসেছে একমাত্র সেইসব যুবক যারা যথার্থই 'যুবক' নামের যোগ্য। শুধুমাত্র বয়সের দ্বারাই কেউ 'যুবক' নামের যোগ্য হয় না, যুবক নামের যোগ্য একমাত্র সে-ই, যার সমাজ ও বিপ্লবী মতাদর্শের প্রতি দৃঢ় দায়বদ্ধতা আছে। সমস্ত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে যাবতীয় নিপীড়ন, শোষণ, অত্যাচার ও অবিচারের

দুয়ের পাতায় দেখুন

যুব সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে কমরেড প্রভাস ঘোষ

একের পাতার পর

বিরুদ্ধে অদম্য সাহস, অপ্রতিরোধ্য চেতনা, নৈতিকতার উচ্চ মান নিয়ে যারা সংগ্রাম গড়ে তোলে, তারাই একমাত্র যুবক নামের যোগ্য।

আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি কেমন, আর যুবসমাজের অবশ্যকরণীয় কর্তব্যই বা কী হওয়া উচিত,তা এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় সম্মেলন বিশ্লেষণ করে স্থির করবে।

আমরা লক্ষ করছি, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের অংশ হিসাবে আমাদের দেশের শাসক-শোষক পুঁজিপতি শ্রেণি নিজেদেরই তৈরি যে সমস্যার সামনে পড়েছে, সেটি হল বাজার সঙ্কট। একচেটিয়া পুঁজিবাদ সর্বোচ্চ মুনাফা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে সর্বাধিক শোষণ চালানোয় জনগণের ক্রয়ক্ষমতা দ্রুত হারে কমে যাচ্ছে। এর পরিণামে বাজার সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে এবং হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। দেশের কোটি কোটি মানুষ যখন কর্মহীন, তখন আরও কোটি কোটি শ্রমিক-কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। আমরা জানি, একচেটিয়া পুঁজিবাদের নিয়ম অনুযায়ী, প্রান্তিক ও গড় মুনাফা নয়, বহুজাতিক ও একচেটিয়া সংস্থাগুলির প্রয়োজন সর্বোচ্চ মুনাফা। সর্বোচ্চ মুনাফার লোভে একচেটিয়া কারবারিরা সর্বোচ্চ শোষণ চালিয়ে যায়। মুনাফার তৃষ্ণা মেটাতে তারা শ্রমিকদের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও নিংড়ে নেয়। জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রের শাসক বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতৃত্বাধীন সরকারগুলির সকলেই একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির অনুগত ভৃত্য এবং সেই কারণে প্রভুদের সেবায় তারা সর্বদাই অত্যন্ত ব্যস্ত। স্থায়ী চাকরি বিলোপ করা হচ্ছে, অত্যন্ত কম মজুরিতে চুক্তি প্রথা চালু করা হয়েছে। আউটসোর্সিং চলছে, শ্রমিকের সংখ্যা কমানোর জন্য ডাউন সাইজিং করছে এমন সময়ে, যখন শুধুমাত্র কোনওক্রমে বেঁচে থাকার জন্য যে কোনওভাবে কিছু অর্থ রোজগারের আশায় হাজার হাজার বেকার যুবক, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার যুবকরা পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হয়ে অমানুষিক শোষণের শিকার হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। বহুজাতিক ও একচেটিয়া কারবারিদের সর্বোচ্চ মুনাফার লালসা পূরণ করতে অসংখ্য কারখানা, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, রাস্তা, রেলপথ, বিমানবন্দরের মতো সংস্থাগুলিকে সস্তায় তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

জানলে অবাক হবেন যে, ভারতের সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশ মানুষের হাতে যে সম্পদ রয়েছে তার পরিমাণ দেশের সবচেয়ে দরিদ্র ৭০ শতাংশ মানুষের মোট সম্পদের সমান। এরই পরিণামে ৮৩ কোটি ভারতীয় দৈনিক ২০ টাকার কম খরচে জীবনধারণ করতে বাধ্য হয়। করোনা অতিমারির সময়ে শতকোটিপতিরা আরও বহু শত কোটি টাকা সম্পদের মালিক হয়েছে। অন্যদিকে গরিব মানুষ হয়েছে আরও গরিব। এই সময়ে এমনকি মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যাও ৯.৯ কোটি থেকে কমে ৬.৬ কোটি হয়েছে। অর্থাৎ ৩.৩ কোটি মধ্যবিত্ত মানুষ সর্বহারা কিংবা আধা-সর্বহারার দলে যোগ দিয়েছে।

গভীর ব্যথার সঙ্গে আমরা লক্ষ করছি, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ অনাহারে এবং চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে মারা যাচ্ছে। আরও হাজার হাজার মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। শত শত শিশু ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁজে খাচ্ছে। পথেই তাদের জন্ম, পথেই তাদের মৃত্যু। অনেকে এ-ও জানে না, কে তাদের বাবা-মা। রাতের অন্ধকারে আরও এক বেদনাদায়ক অন্ধকারের ছবি দেখা যায়। ক্ষুধাতুর সন্তান ও শয্যাশায়ী পরিজনদের মুখে যে ভাবে হোক দু-মুঠো খাবার তুলে দেওয়ার তাড়নায় গৃহবধূ ও ঘরের মেয়েরা শরীর বিক্রি করতে বাধ্য হন। নারী-পাচার এখন এক লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এই ভারতের জন্যই কি আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা শহিদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন?

পুঁজিপতিদের অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে জনগণকে শোষণ করার, পুরোপুরি ক্রীতদাসে পরিণত করার এবং শোষণযন্ত্রে পিষে ফেলার। সংসদীয় নির্বাচন হল স্রেফ একটি প্রতারণা, যেখানে পুঁজিপতিরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবাদাসদের সরকারি ক্ষমতায় বসায় অথবা পরিবর্তন করে। বহুদিন আগেই 'গণতন্ত্র'-এর আলখাল্লার আড়ালে সংসদীয় গণতন্ত্র ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারে পরিণত হয়েছে। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রশক্তি মতবিরোধ ও প্রতিবাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করছে, বিক্ষোভ ও আন্দোলনগুলিকে নির্মমভাবে দমন করছে। বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত, প্রতারক। মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে জনগণকে তারা ঠকায়। জনগণের সম্পদ লুঠ করে, ঘুষ নিয়ে এবং বুর্জোয়া প্রভুদের থেকে গোপনে বেতন নিয়ে তারা নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে। সকলেই জানেন কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের ক্রিমিনালসুলভ অবহেলায় কোভিড অতিমারিতে কীভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হল। শত শত মৃতদেহ এমনকি নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, দাহ না করে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। এই সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বাজেট ক্রমাগত ছাঁটাই করে চলেছে, বাড়িয়ে চলেছে সামরিক বাজেট। এই কি সেই স্বাধীনতা যার আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশবাসীর ছিল?

সকলেই জানেন যে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের সামনে শিক্ষার দরজা বন্ধ করে দিয়ে পুঁজিপতিদের মুনাফা লুটতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকিকরণ করা হচ্ছে। উপরন্তু, সিলেবাসে ইতিহাসের পরিবর্তে পৌরাণিক কাহিনী স্থান পাচ্ছে, বিজ্ঞানের পরিবর্তে পড়ানো হচ্ছে অধিবিদ্যা ও স্যুডো-সায়েন্স (ছদ্ম বিজ্ঞান) যাতে বিজ্ঞানভিত্তিক মানসিকতা ধ্বংস হয়ে যায়, যুক্তিবোধ নষ্ট হয়ে যায়। ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির প্রসারের জন্য ধর্মীয় গোঁড়ামি, রহস্যবাদ, মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত, প্রাদেশিকতাকে উস্কানি দিচ্ছে শাসকরা যাতে জীবনের মূল সমস্যাগুলি থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ভাঙতে এবং দাঙ্গা বাধানোর ষড়যন্ত্রে ব্যবহার করা যায়। নবজাগরণের অগ্রদূতরা কি আগামী ভারতের এই স্বপ্নই দেখেছিলেন?

নবজাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান অগ্রদূতদের জীবন ও সংগ্রাম বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দেওয়ার দূরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্রও চলছে যাতে অনৈতিকতা, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, ভোগবাদ, নোংরা যৌনতার প্রসার ঘটিয়ে, মদ-ড্রাগ-আফিংয়ের নেশায় ডুবিয়ে দিয়ে তরুণ প্রজন্মের মানসিকতা দূষিত করে তুলে তাদের অমানুষ বানানো যায়। পরিণামে গোটা সমাজ আজ প্রায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধহীন হয়ে নোংরা পচা-গলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্নেহ-মমতা-ভালবাসার মতো কোমল অনুভূতিগুলি মরে যাচ্ছে, পরিবারগুলোতে শান্তি নেই, ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধ অসহায় মা-বাবাদের রাস্তায় বের করে দিচ্ছে, না হয় বড় জোর মৃত্যুর দিন গুনতে তাঁদের বৃদ্ধাবাসে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আরও একটি ভয়ঙ্কর চিত্র আছে। প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তে শত শত মহিলা ধর্ষিতা, গণধর্ষিতা এমনকি খুন হয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে নাবালিকা, এমনকি নব্বই বছরের বৃদ্ধা কিংবা তিন বছরের শিশুকন্যা পর্যন্ত। পশুজগতেও এমন পাশবিকতা দেখা যায় না। ধর্ষণকারী হয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। মানবজাতির নিকৃষ্টতম শত্রু ভয়ঙ্কর পুঁজিবাদের সৃষ্টি হল এইসব ধর্ষণকারীরা। এই অমানুষিক পরিস্থিতি কি চলতে দেওয়া যায়? জীবনের এই সমস্ত অসহনীয় সমস্যার সমাধান কোথায়?

শোষিত মানুষকে রাজনৈতিক ভাবে শিক্ষিত করে তুলে, তাদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে পুঁজিবাদ ও তার সেবক রাষ্ট্র ও সরকারগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রামে তাদের যুক্ত করার পথেই রয়েছে এর সমাধান। বর্তমানে শোষিত মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ কোনও রাজনৈতিক দল বা প্রখ্যাত নেতার নেতৃত্ব ছাড়াই নানা গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মতো উত্থিত হচ্ছে — যা অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। যে কৃষকসমাজকে এতদিন অসচেতন, পিছিয়ে-পড়া, উদ্যোগহীন, নিষ্ক্রিয় বলে ভাবা হত, এক বছর ধরে নানা আক্রমণ, প্রবল শীত, প্রখর রোদ, বিপুল বর্ষা, ঘন কুয়াশা অগ্রাহ্য করে সাতশোটি জীবনের বিনিময়ে সেই কৃষকদের সাম্প্রতিক শক্তিশালী আন্দোলন ও তার মহিমান্বিত বিজয় প্রমাণ করে দিয়েছে দীর্ঘস্থায়ী দৃঢ় আন্দোলন কী বিস্ময়কর ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে। এই আন্দোলন একটি আত্মম্ভরী একগুঁয়ে ফ্যাসিবাদী সরকারকে নত হয়ে কৃষকদের প্রধান দাবিগুলি মেনে নিতে বাধ্য করেছে।

সর্বত্রই জনগণের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। তারা প্রতিবাদ করতে চাইছে, তারা আন্দোলন করতে চাইছে, তারা পরিবর্তন চাইছে। চারিপাশে বিক্ষোভের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে, যে কোনও জায়গায় এ থেকে সৃষ্টি হতে পারে প্রবল অগ্নিকাণ্ড।

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কখনও কিছু আশু দাবিদাওয়া আংশিকভাবে অথবা পূর্ণ রূপে আদায় করা যেতে পারে। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার বৈপ্লবিক হাতিয়ারে সজ্জিত শ্রমিক শ্রেণির পার্টির নেতৃত্বে সর্বহারা বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত জীবনের সমস্ত সমস্যার মূল কারণটির অস্তিত্ব বজায় থেকে যাবে এবং তা আরও তীব্র সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকবে। সেই কারণে, সর্বহারা শ্রেণির একটি দল যখন কোনও আন্দোলন সংগঠিত করে বা তাতে যোগ দেয়, শুধু কয়েকটি আশু দাবি আদায় করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে না। তার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে বিপ্লবী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো, সংঘবদ্ধভাবে লড়তে শেখানো, এবং যে মুহূর্তে আন্দোলনকারীদের চেতনায় প্রাথমিক সচেতনতার অস্পষ্ট আভাস দেখতে পাওয়া যায়, তখনই সেই আন্দোলনকে রাজনৈতিক শিক্ষার স্কুলে পরিণত করা—এই পথে বিপ্লবের জমি প্রস্তুত করা। মনে রাখতে হবে যে, শোষিত নিপীড়িত মানুষ নিজে নিজেই আন্দোলনের মধ্যে থেকে বিপ্লবী রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে না, বিপ্লবীদেরই তা জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হয়।

মানব সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে বিপ্লবের আঘাতে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে শোষিত জনগণকে শিক্ষিত, রাজনৈতিক ভাবে সচেতন ও সংগঠিত করার ঐতিহাসিক দায়িত্বটি কে বহন করতে পারে? এ দায়িত্ব বহন করতে পারে কেবলমাত্র যুবকরাই— সেই প্রকৃত যুবকরাই যারা সাহসী, নিঃস্বার্থ, উচ্চ নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার বৈপ্লবিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অদম্য ও শঙ্কাহীন চেতনার অধিকারী।

এখানে সমবেত হয়েছেন যে যুবকরা, বর্তমান সময়ের জন্য অতি-জরুরি এই প্রয়োজনে তাঁরা কি সাড়া দেবেন? এই সম্মেলনের সাফল্য নিহিত আছে এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে।

কমরেডরা, আপনারা মাথা উঁচু করে দাঁড়ান। পেটি-বুর্জোয়া মানসিকতা ও জীবনযাত্রা ত্যাগ করুন। বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর সৃষ্টি করে নিপীড়িত জনগণ থেকে নিজেদের দূরে রাখবেন না।। তাদের সাথে মিশুন — তাদের চেতনার মান উন্নত করার জন্য, নিজেদের নিচু স্তরে নামিয়ে আনার জন্য নয়। এগিয়ে আসুন বলিষ্ঠভাবে, সাহসের সাথে, পূর্ণ তেজ নিয়ে। সমৃদ্ধ করুন নিজেদের জ্ঞানভান্ডার। নিজস্ব উদ্যোগ বাড়ান এবং বিপ্লবের প্রচারক হিসাবে, সংগঠক ও আন্দোলনকারী হিসেবে নিজের/নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।

ছাত্র-যুবদের প্রতি মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ যে উদাত্ত আহ্বান রেখে গেছেন, আমি তা পুনরায় আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি বলেছেন, "সমাজ বিকাশের প্রতিটি স্তরে, সমস্ত দেশে, বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছাত্র-যুবরাই নিজেদের সম্পূর্ণ রূপে উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসে। মানুষের কাছে যান, তাদের উদ্বুদ্ধ করুন, হাজারে হাজারে তাদের সংগঠিত করুন এবং নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি সৃষ্টিতে তাদের সাহায্য করুন। তাহলেই সময় আসবে যখন জনগণ সক্রিয় হয়ে উঠবে— যাকে আমরা বলি বিপ্লব।"

এই ঐতিহাসিক আহ্বানে সাড়া দেওয়ার উপরেই নির্ভর করছে ডিওয়াইও-র এই সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রকৃত সাফল্য। আমি আশা করি, নিশ্চিত ভাবেই আপনারা এতে সাড়া দেবেন।

আপনাদের সকলকে আমার লাল সেলাম।

মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তাঁর মতবাদ

ভ ই লেনিন

মানবমুক্তির দর্শন হিসাবে মার্কসবাদ জানতে ও বুঝতে দলের মধ্যে আদর্শগত চর্চার যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলছে তার সহায়ক হিসাবেই আমরা কার্ল মার্কসের জীবন ও মার্কসবাদ সম্পর্কিত লেনিনের লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এবার দ্বিতীয় কিস্তি।

(২)

দ্বান্দ্বিকতা

বিকাশের সবচেয়ে সর্বাঙ্গীণ, সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং সবচেয়ে গভীর মতবাদ হিসেবে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে মার্কস ও এঙ্গেলস চিরায়ত জার্মান দর্শনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করতেন। বিকাশের, বিবর্তনের অন্য সমস্ত নীতিসূত্রগুলিকে তাঁরা মনে করতেন একপেশে ও বিষয়ের দিক থেকে দুর্বল এবং সেগুলি প্রকৃতি ও সমাজ বিকাশের ধারাটি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণার বিকৃতি ও অঙ্গহানি ঘটায় (যে ধারা প্রায়ই সম্পূর্ণ হয় অতি দ্রুত, ঝড়ঝঞ্ঝা এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে)। 'বলতে গেলে একমাত্র মার্কস এবং আমিই ক্রিয়াশীল দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব উদ্ধার করেছিলাম ... (হেগেলবাদ সহ ভাববাদের সম্পূর্ণ আচ্ছন্নতা থেকে) তাকে প্রকৃতি সম্পর্কে বস্তুবাদী ধারণায় রূপান্তরিত করে ...। প্রকৃতি হল দ্বন্দ্বতত্ত্ব পরীক্ষার কষ্টিপাথর এবং আমাদের বলতেই হবে যে, এই পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞান বিপুল পরিমাণ উপাদান সরবরাহ করেছে। প্রতিদিন তার পরিমাণ বাড়ছে। শেষ বিচারে প্রকৃতি এগিয়ে চলে দ্বান্দ্বিক পথে, অধিবিদ্যা নির্ধারিত পথে বা ভাববাদী পথে নয় (এ কথা লেখা হয়েছিল রেডিয়ম, ইলেকট্রন,

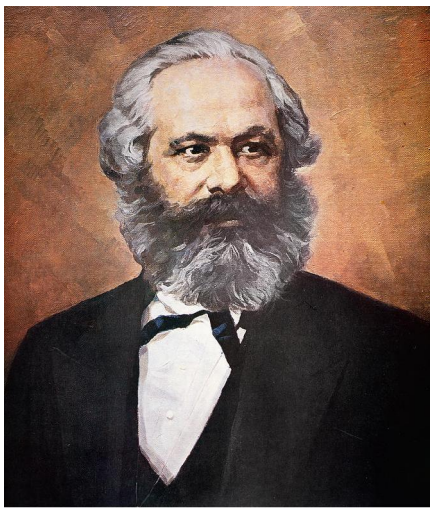

মৌলিক পদার্থের রূপান্তর প্রভৃতি আবিষ্কারের আগেই!)'। (অ্যান্টি ডুরিং, এঙ্গেলস)

আবার এঙ্গেলস লিখেছেন ঃ 'এই বিশ্বকে আগে থেকেই সম্পূর্ণ হওয়া বস্তুসমূহের সমাহার হিসাবে দেখা উচিত নয়, বরং বিশ্ব হল বহু প্রক্রিয়ার সমাহার, যেখানে আপাতদৃষ্টিতে স্থায়ী বস্তুসমূহ তথা আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে (আমাদের ধারণায়) সেগুলির প্রতিচ্ছবি অবিরাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে, কখনও উদ্ভূত হচ্ছে, কখনও বিলুপ্ত হচ্ছে। সেগুলি আপাত অর্থে আকস্মিক এবং ক্ষণস্থায়ী রূপে পশ্চাদগামী হলেও শেষপর্যন্ত তা এগিয়ে চলে বিকাশের পথে— এই মহান বুনিয়াদী ধারণা, বিশেষত হেগেলের সময় থেকে, সর্বজনীন চেতনার এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে, সাধারণ আকারে এ উক্তির প্রতিবাদ বর্তমানে কেউই প্রায় করবে না। কিন্তু এই ধারণাটিকে কথায় স্বীকার করা এক জিনিস, আর প্রতিটি আলাদা ঘটনায়, অনুসন্ধানের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হল আলাদা জিনিস।'

'দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের দৃষ্টিতে চিরকালীন বা পরম এবং পবিত্র বলে কিছু নেই। সবকিছুর ওপরে, সবকিছুর ভেতরে এই দর্শন অনিবার্য ক্ষয়ের সিলমোহর দেখে। সৃষ্টি ও ধ্বংসের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াকে কোনও কিছুই প্রতিরোধ করতে পারে না। নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে অন্তহীন এগিয়ে চলার ধারা— দর্শন হল চিন্তাশীল মানব মস্তিষ্কে এই প্রক্রিয়ারই সরল প্রতিফলনের ফল।' এইভাবে মার্কসের মতে দ্বান্দ্বিকতা হল 'বহির্জগৎ ও মানুষের চিন্তাজগতের গতির সাধারণ নিয়ম সংক্রান্ত বিজ্ঞান'।

হেগেলীয় দর্শনের এই বিপ্লবী দিকটাকে মার্কস গ্রহণ করেন ও বিকশিত করে তোলেন। সমস্ত বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোনও দর্শনের প্রয়োজন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নেই। পূর্বতন দর্শনগুলি থেকে রয়ে গেল 'চিন্তার বিজ্ঞান ও তার নিয়মকানুনগুলি, অর্থাৎ সাধারণ যুক্তিবিজ্ঞান (ফর্মাল লজিক) ও দ্বান্দ্বিকতা।'

হেগেলকে অনুসরণ করে মার্কস যে দ্বান্দ্বিকতা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তার মধ্যে রয়েছে বর্তমানে যাকে বলা হয় চেতনার তত্ত্ব বা জ্ঞানতত্ত্ব বা জ্ঞান ও চেতনার দর্শন। এটি এমন এক বিজ্ঞান যার গভীর অনুশীলন করা প্রয়োজন। জ্ঞান ও চেতনার ক্রমবিকাশ, অচেতন অবস্থা থেকে চেতনার স্তরে পৌঁছানোর ধারা— এগুলিকে বিচার করতে হবে ঐতিহাসিক ভাবে এবং অর্জিত জ্ঞানের সাধারণীকরণের মধ্য দিয়ে।

আমাদের সময়ে বিকাশের ধারণা, বিবর্তনের ধারণা প্রায় পুরোপুরি সামাজিক চেতনার মধ্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু তা করেছে অন্য পথে, হেগেলীয় দর্শনের মধ্য দিয়ে নয়। কিন্তু হেগেলের দর্শনের ভিত্তিতে মার্কস ও এঙ্গেলস এই বিষয়ে যে ধারণাকে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন, তা অনেক বেশি সামগ্রিক, বিবর্তনের প্রচলিত তত্ত্বের তুলনায়, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তা অনেক বেশি সমৃদ্ধ। পার হয়ে আসা স্তরগুলিতে যেমন ছিল, এই বিকাশ তার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। কিন্তু এই পুনরাবৃত্তি ঘটে অন্য ভাবে, উচ্চতর স্তরে (নেগেশন অফ নেগেশন)। এই বিকাশ বলতে গেলে সরল রেখায় হয় না, এর গতি আঁকাবাঁকা। অতি দ্রুতগতিতে, ঝড়ঝঞ্ঝা, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ঘটে এই বিকাশ। বিকাশের দ্বান্দ্বিক নিয়মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল 'ধারাবাহিকতার মধ্যে ঘটে ছেদ', পরিমাণগত থেকে গুণগত রূপান্তর, বিকাশের জন্য দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত অভ্যন্তরীণ তাড়না, একটি নির্দিষ্ট বস্তু, ঘটনা অথবা একটি নির্দিষ্ট সমাজের ভিতরে সক্রিয় বিভিন্ন শক্তি ও প্রবণতাগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। প্রতিটি ঘটনাই সার্বিক ভাবে পরস্পর-নির্ভর এবং এদের মধ্যে আছে সুনিবিড়, অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ (ইতিহাস এর নতুন নতুন দিক উদঘাটন করছে)। এ যোগাযোগ থেকেই বিশ্বজনীন গতির একক নিয়মের উদ্ভব। প্রচলিত মতবাদের তুলনায় দ্বন্দ্বতত্ত্ব বিকাশের নিয়ম হিসাবে অনেক বেশি অর্থবহ। (১৮৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের চিঠি দ্রষ্টব্য। এই চিঠিতে মার্কস বিদ্রূপ করেছিলেন স্টাইনের 'কেঠো ট্রাইকোটমিকে', বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতার সঙ্গে যা গুলিয়ে ফেলা হাস্যকর।) (চলবে)

বিজেপির সুশাসন

একের পাতার পর

করার জন্য তৈরি। বলেছেন, ভারতের আদর্শ নাথুরাম গডসে। এমনকি এক তথাকথিত সাধু মহারাজ বলে দিয়েছেন, সংখ্যালঘুদেরও দেশের সম্পদে অধিকার আছে— এ কথা বলার অপরাধে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বুকে ৬টি বুলেট ভরে দিতে চান। আর এক মহারাজ বলেছেন, প্রভাকরণ কিংবা ভিন্দ্রানওয়ালের মতো সন্ত্রাসবাদী চাই, নির্বিচারে হত্যা করতে যাদের হাত কাঁপবে না। শুধু হরিদ্বারে নয়, ১৯ ডিসেম্বর খোদ দিল্লিতে ভারতকে 'হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর ডাক দিয়ে 'লড়ো এবং মারো' এই স্লোগান তোলা হয়েছে। এক হিন্দি চ্যানেলের সম্পাদক উপস্থিত থেকে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর কায়দায় যুবকদের এই হত্যার শপথ গ্রহণ করিয়েছেন। ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর তিনদিন ধরে এই সমস্ত অমৃতবাণী বর্ষিত হলেও উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকারের পুলিশ কিংবা সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পরিচালনাধীন দিল্লি পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেওয়ারই প্রয়োজন বোধ করেনি। দেশের এবং বিদেশেরও লক্ষ লক্ষ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠি লিখে ব্যবস্থা দাবি করেছেন। অথচ মাত্র দুজনের বিরুদ্ধে এফআইআর ছাড়া পুলিশ কিছুই করেনি। এমনকি মূল উদ্যোক্তার বিরুদ্ধেও অভিযোগটুকুও করেনি। হরিদ্বারের পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে, তারা কোনও ব্যবস্থা নেবে না।

যদিও তথাকথিত হিন্দুত্বের রক্ষকরা বসে থাকেনি। ইতিমধ্যেই ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিজেপি শাসিত হরিয়ানার গুরুগ্রামের পতৌদিতে এক গির্জায় প্রার্থনারত মানুষদের উপর হামলা চালিয়েছে বিজেপির মদতপুষ্ট বাহিনী। বিজেপিরই শাসনে থাকা কর্ণাটকে একাধিক গির্জায় হামলা হয়েছে। একইভাবে হামলা হয়েছে বিজেপি শাসিত আসামে শিলচরের গির্জায়। হরিদ্বারের ঘটনার অন্যতম আয়োজক স্বঘোষিত ধর্মগুরু নরসিংহানন্দ আগামী জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই উত্তরপ্রদেশে একই ধরনের ধর্মসংসদ ডাকার কথা ঘোষণা করেছেন। উদ্দেশ্য সে রাজ্যের আসন্ন ভোটে বিজেপির পক্ষে ভোটব্যাঙ্কের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করা। স্মরণ করা দরকার ২০২০-র ১২-১৩ জানুয়ারি এই নরসিংহানন্দই দিল্লি বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে সেখানে ধর্মসংসদের আয়োজন করে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার দেড়মাসের মধ্যে ঘটে দিল্লি গণহত্যা। একই কায়দায় গণহত্যা শুরুর ঠিক আগে বিজেপি নেতারা এমনকি একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 'গোলি মারা'-র, সংখ্যালঘুদের নিধনের দাওয়াই বাতলেছিলেন। তার বিষময় ফল কী হয়েছিল আজ সকলের জানা। কয়েকশত মানুষের জীবন গেছে, শত শত পরিবার তাদের শেষ কপর্দকটুকু হারিয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। এতবড় অপরাধের জন্য এদের কারও কোনও শাস্তি হয়নি। বরং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনে থাকা দিল্লি পুলিশ মামলা দায়ের করেছে নিরপরাধদের বিরুদ্ধেই।

অবশ্য আজকের ভারতে এটাই হওয়ার কথা। খোদ প্রধানমন্ত্রী যেখানে উত্তরপ্রদেশ সহ পাঁচ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোটের কথা ভেবে পরিবেশন করে চলেছেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী জিগির। তিনি এবং তাঁর যোগ্য দোসর মুখ্যমন্ত্রী এখন যে কোনও ভাবে টেনে আনছেন আফগানিস্তানের তালিবানের কথা। আর শোনাচ্ছেন মুঘল শাসকদের সম্বন্ধে বিকৃত ইতিহাসের গল্প। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করতে গিয়ে শোনাচ্ছেন রাম মন্দিরের কথা। নিজেদের কোন কীর্তিটি ফলাও করে বলবেন তাঁরা? অনেক বছর চলেছে রাম মন্দিরের জিগির তুলে। এখন বুঝছেন এটা আর আগের মতো কাজ করছে না। এদিকে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রল ডিজেল-কেরোসিন-গ্যাসের আকাশছোঁয়া দাম মানুষকে খাদের কিনারায় ঠেলে দিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভয়াবহ বেকারি, ছাঁটাই, স্থায়ী চাকরির আকাল, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, নারী নির্যাতন-ধর্ষণ-খুনের ভয়াবহ বৃদ্ধি। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ ফেটে পড়ছে। করোনা মহামারি প্রতিরোধে কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকারের চরম অপদার্থতায় শত শত মানুষের মৃতদেহ গঙ্গায় ভেসেছে। আরও বহু মানুষের দেহ পুঁতে দিতে হয়েছে হয়েছে নদীর চরে।

বিজেপির আরও আশঙ্কার কারণ, কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের রাজ্যে রাজ্যে কৃষক আন্দোলনে মানুষের ঢল নামা। আন্দোলনের তীব্রতার সামনে একচেটিয়া পুঁজির মালিক-প্রভুদের গোঁসা সত্ত্বেও সরকারকে আপাতত কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হয়েছে। দেশ জোড়া প্রতিবাদের মুখে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ বিল, বিদ্যুৎক্ষেত্রকে পুরোপুরি বেসরকারি হাতে বেচে দেওয়ার বিল ইত্যাদি আপাতত সংসদে আনারই সাহস করেনি সরকার। তাই উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড সহ বিভিন্ন রাজ্যে আসন্ন ভোটে বিজেপির একমাত্র হাতিয়ার 'হিন্দু-বিপন্ন' এই ভুয়ো সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে ভোট পাওয়ার চেষ্টা করা। তার জন্য যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে নরহত্যা করতে হয়, অসংখ্য মানুষের সর্বনাশ করতে হয় তাতেও তাদের আপত্তি নেই।

বিজেপি হিন্দুরাজের ধ্বনি তুলছে। একই

চারের পাতায় দেখুন

বিয়ের বয়স ১৮ থেকে ২১ বছর করা একটি প্রতারণা

মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ থেকে ২১ বছর করা একটি প্রতারণা। মেয়েদের মূল সমস্যা আড়াল করার এটি এক অশুভ প্রয়াস। ২৩ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি। তিনি বলেন, ১৮ বছর বয়সেই মেয়েদের ভোটাধিকার আছে এবং বিয়ের বর্তমান বয়স ১৮। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাবালিকা-বিবাহ ব্যাপক হারে চলছে। অভাবের কারণে বহু বাবা-মা ১৮ বছরের আগেই মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছেন।

আমাদের মতো একটা পুঁজিবাদী সমাজে মেয়েদের কোনও নিরাপত্তা নেই। শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকরি, পারিবারিক সম্পত্তি সর্বত্রই এরা বৈষম্যের শিকার। প্রতিদিন মেয়েরা শারীরিকভাবে হেনস্থার শিকার হচ্ছে, ধর্ষিতা হচ্ছে, পাচার হয়ে যাচ্ছে। যে অল্প সংখ্যক মেয়ে অসবর্ণ বিয়ে বা অন্য ধর্মে বিয়েতে সাহস দেখিয়েছে, তাদের অনেকেই পরিবারিক সম্মানের অজুহাতে অনার কিলিং-এর শিকার হচ্ছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নীরব দর্শক, মেয়েদের পাশে দাঁড়াতে তাদের কোনও ভূমিকা নেই। এই পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা নানাভাবে প্রথমে বাবা ও পরে স্বামীর অবদমনের শিকার। এগুলিই মেয়েদের জীবনের মূল সমস্যা। এগুলি সমাধানের দিকে নজর দেওয়া যখন জরুরি তখন তা না করে বিয়ের বয়স ১৮ থেকে বাড়িয়ে ২১ করা সরকারের একটা চমক ছাড়া কিছু নয়।

নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের ডিআরএম ডেপুটেশন

১ নভেম্বর থেকে রাজ্যের সমস্ত ডিভিশনে লোকাল-প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু হলেও আদ্রা ডিভিশনে হাতে গোনা কয়েকটি ট্রেন চলছে। রেল পরিষেবার উন্নয়ন না ঘটিয়ে শুধু ট্রেনগুলির নাম পরিবর্তন করে ভাড়া দ্বিগুণ-তিনগুণ বাড়ানো হয়েছে।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলার নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের উদ্যোগে ১৭ ডিসেম্বর আদ্রায় ডিআরএম ডেপুটেশন দেওয়া হয়। রেলের বেসরকারিকরণ বন্ধ, বর্ধিত ভাড়া ও প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম প্রত্যাহার, আদ্রা ডিভিশনের সমস্ত লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু, পুনর্বাসন না দিয়ে রেল বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদ সহ ৯ দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

শতাধিক নাগরিকের মিছিল আদ্রার বিভিন্ন রাস্তার পরিক্রমা করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন এম কে সিনহা, ভুতনাথ মাহাতো, লক্ষ্মী সরকার, সাবিরুদ্দিন ভুঁইয়া। ডিআরএম দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনার কথা বলেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলার দাবিতে ডেপুটেশন

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি খোলা সহ ১২ দফা দাবিতে ২০ ডিসেম্বর হুগলি জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিল এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়ন (ছবি প্রথম পাতায়)।

দীর্ঘ প্রায় দুই বছর করোনা পরিস্থিতির কারণে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি বন্ধ আছে। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া বাড়ির মা ও শিশুদের অপুষ্টিজনিত নানা সমস্যা বাড়ছে। রান্না করা খাবারের পরিবর্তে টিএইচআর দেওয়া হলেও তা রান্না করা খাবারের বিকল্প নয়। গত পাঁচ মাসের রেশন বকেয়া আছে। ইউনিয়নের দাবি— অবিলম্বে পাঁচ মাসের টিএইচআর উপভোক্তাদের দেওয়া, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির উপযুক্ত পরিকাঠামো না গড়ে পোষন ট্র্যাকার অ্যাপ চালু না করা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, কর্মরত অবস্থায় মৃতের পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা এককালীন ও পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া, ন্যূনতম বেতন ২১ হাজার টাকা করা, করোনা আক্রান্ত ও করোনায় মৃত কর্মী ও সহায়িকাদের ক্ষতিপূরণ, সমস্ত শূন্যপদে কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগ প্রভৃতি। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জলিরানী চ্যাটার্জী, রীতা মাইতি, লিলুয়া ইয়াসমিন প্রমুখ।

নদীয়া জেলা ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার কর্মচারী ইউনিয়নের আহ্বানে জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন। ১৪ ডিসেম্বর ২০২১

পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন

১৯ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পুরুলিয়া শহরে নীলকুঠি ডাঙা ক্লাব হলে। রঘুনাথপুর, ঝালদা ও পুরুলিয়ার পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সম্পাদক প্রবীর মাহাতো, পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের জেলা সম্পাদিকা অর্চনা খান এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি সুচেতা কুণ্ডু। সম্মেলনে সুস্মিতা মাহাতকে সভাপতি, রাধা রানী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রিম ব্যানার্জিকে যুগ্ম সম্পাদক করে দশ জনের কমিটি গঠিত হয়।

আসামে হাসপাতাল উন্নীতকরণের দাবিতে কনভেনশন

আসামের উদালগুড়ি জেলার টংলায় লক্ষাধিক মানুষের একমাত্র হাসপাতাল টংলা গ্রামীণ হাসপাতালকে ২০০ শয্যাযুক্ত হাসপাতালে উন্নীত করার দাবিতে এআইএমএসএস এবং এআইডিওয়াইও-এর উদ্যোগে ১৯ ডিসেম্বর টংলা বালিকা বিদ্যালয়ে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ দুই শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনে চন্দ্রপ্রভা দত্তকে সভাপতি এবং কমরেড স্বর্ণলতা চলিহাকে সম্পাদক করে ৩১ সদস্যের 'টংলা গ্রামীণ চিকিৎসালয় উন্নীতকরণ দাবি কমিটি' গঠন করা হয়।

জমির রেকর্ড, দাগ-খতিয়ান সংক্রান্ত কাজ সহ সব কাজে দুর্নীতি রোধ, দালালচক্র বন্ধ করা, রেশনব্যবস্থায় হয়রানি বন্ধ প্রভৃতি দাবিতে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া বিএলআরও অফিসে এসইউসিআই (সি)-র নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর বহু মানুষ মিছিল করে গিয়ে ডেপুটেশন দেন।

এটাই বিজেপির সুশাসন

তিনের পাতার পর

সাথে আবার প্রধানমন্ত্রী আজাদ হিন্দ বাহিনীর পতাকা তুলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে স্মরণের ভড়ং করছেন। অথচ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন, "... হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে 'হিন্দুরাজের' ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা। ...শ্রমসিক্ত জনসাধারণ যে সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন, সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি তার কোনওটির সমাধান করিতে পারিবে কি? কী ভাবে বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, প্রভৃতি সমস্যার সমাধান হইবে সে সম্বন্ধে তাহারা কোনও পথ নির্দেশ করিয়াছে কি?"(১৪ জুন ১৯৩৮, কুমিল্লায় ভাষণ) এই মহান বিপ্লবী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "...আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং যারা সেই সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে তারা আমাদের শত্রু এবং ভারতের জাতীয়তার শত্রু। আজকে হিন্দু মহাসভা মোসলেম বিদ্বেষের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে অবলীলাক্রমে ইংরাজের সাথে মিলতে পারে, মুসলমানকে জব্দ করতে যেনতেন প্রকারেণ।...মনে রাখতে হবে আমাদের শত্রু হল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ এবং যে সমস্ত ভারতবাসী এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠান তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তারাও।" (১৫ মে ১৯৪০, ২৪ পরগণার যুব সমাবেশে ভাষণ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ এই সময় পত্রিকা থেকে গৃহীত)। নেতাজিকে হাতে পেলে তাঁর বুকেও বুলেট ভরে দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই আরএসএস-বিজেপির মদতপুষ্ট গুরুরা বলত!

পুঁজিবাদী বাজারের তীব্র সংকটকে সামাল দিতে পুঁজিপতি শ্রেণি চাইছে তার শোষণের মাত্রাকে চরম সীমায় নিয়ে যেতে। এর বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে যে তীব্র বিক্ষোভের জন্ম হচ্ছে তা তাদের মাথাব্যথার কারণ। এই বিক্ষোভ সঠিক পথ, সঠিক রাজনীতি পেলে সমাজবদলের বিপ্লবের পথে চলে যাবে। সেই আশঙ্কায় শাসক শ্রেণি চায় মানুষকে বিপথগামী করতে, দাঙ্গা হানাহানির মধ্যে তাদের ফাঁসিয়ে দিয়ে মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে। পুঁজিপতিরা যাতে অবাধে লুঠ চালাতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিতে। সেজন্য তারা চায় ফ্যাসিবাদ কায়েম করে মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটাকেই মেরে দিতে। সাম্প্রদায়িকতা এই কাজে তাদের বড় হাতিয়ার। বিজেপি একচেটিয়া মালিকদের সেবাদাস হিসাবে সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। তাদের সুবিধা করে দিয়েছে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বুর্জোয়া রাজনীতির কারবারিদের একই ধরনের নরম কিংবা গরম সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের রাজনীতি।

এই সর্বনাশা রাজনীতির বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপায় খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন। যে পথ দেখিয়েছে সদ্য বিজয়ী কৃষক আন্দোলন। এই পথেই মোকাবিলা করতে হবে বিজেপি সহ সমস্ত ফ্যাসিবাদী রাজনীতির।

জেলায় জেলায় আশাকর্মীরা আন্দোলনে

পূর্ব বর্ধমান

পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্যামপুর, হাওড়া গ্রামীণ

সিপিএম গেল, তৃণমূল এল— কিন্তু ৫৪ হাজার আশাকর্মীর সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি জুটল না। অথচ এঁরা সরকার দ্বারা নিয়োজিত। এআইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের লাগাতার আন্দোলনের চাপে কিছু কিছু দাবি আদায় হলেও, ভাতা কিছুটা বাড়লেও তাঁদের মূল দাবি এখনও সরকার উপেক্ষা করছে। সম্প্রতি এক মাসের ভাতা ৮ কিস্তিতে দেওয়ার খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত চাপানো হয়েছে। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে জেলায় জেলায়। ৭ জানুয়ারি কলকতায় হবে কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ।

জনজীবনের বাস্তব সমস্যা আড়াল করতেই ধর্মান্তর বিরোধী আইন পাশ কর্ণাটকে

কর্ণাটক বিধানসভায় সম্প্রতি ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার ধর্মান্তর বিরোধী যে আইন পাশ করিয়েছে তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন এস ইউ সি আই (সি) কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড কে উমা। তিনি বলেন, ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে চালু আইনগুলিই যথেষ্ট, নতুন কোনও আইনের প্রয়োজন ছিল না। বিজেপি ও সংঘ পরিবার এই আইন আনল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে সন্ত্রস্ত করার জন্য। দ্বিতীয় যে উদ্দেশ্যটি কাজ করেছে তা হল, জনজীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে রাজ্যে যে আন্দোলন চলছে তা থেকে মানুষের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

তিনি বলেন, তীব্র মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, বন্যার প্রকোপে রাজ্যের মানুষ বিপর্যস্ত। ছাত্ররা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে লড়ছে, তাদের স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে না, ফি কনসেশন দেওয়া হচ্ছে না। কৃষকরা লড়ছে এম এস পি-র দাবিতে। শ্রমিকরা লেবার কোডের বিরুদ্ধে লড়ছে। এই অবস্থায় জনজীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের পরিবর্তে হঠাৎ ধর্মান্তর বিরোধী আইন প্রবর্তন নিষ্প্রয়োজন। তিনি এর বিরুদ্ধে সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

শিলিগুড়িতে এআইডিএসও-র মিছিল

পরিবহণের ছাত্র ভাড়া এক তৃতীয়াংশ করা, পরিবহণে সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করা, বিভিন্ন রুটে সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা প্রভৃতি দাবিতে শিলিগুড়িতে ২০ ডিসেম্বর আরটিও দপ্তরে ডেপুটেশন দেয় এআইডিএসও। মিত্র সম্মিলনী হলের সামনে থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল ভেনাস মোড়, হাসপাতাল মোড় হয়ে কোর্ট মোড়ে আরটিও অফিসের সামনে আসে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমরেডস কল্লোল বাগচী, রীনা মণ্ডল, রাজু রায়, কমরেড জাগির হোসেন প্রমুখ।

আন্দোলনে বর্ধিত খেয়াভাড়া রদ

পাথরপ্রতিমায় নাগরিকদের সম্মিলিত আন্দোলনে বাতিল হল বর্ধিত খেয়াভাড়া। সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লক জনবসতিপূর্ণ অনেকগুলো ব-দ্বীপ নিয়ে গঠিত। ফলে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যেতে খেয়া নৌকাই একমাত্র উপায়। সরকারি আইন মোতাবেক পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতি এই সকল খেয়া পরিষেবায় ইজারা বন্দোবস্ত করে ও নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করে।

পঞ্চায়েত সমিতি বিজ্ঞপ্তি দেয়, ১ নভেম্বর, ২০২১ থেকে খেয়া পরিষেবাগুলির পারানি মাশুল ক্ষেত্রবিশেষে ৫০ শতাংশ বা তারও বেশি বৃদ্ধি পাবে। আবার খেয়া ইজারাদাররা কোথাও কোথাও আগে থেকেই পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে বর্ধিত পারানি মাশুল আদায় করতে থাকে। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পাথরপ্রতিমা-রামগঙ্গা লোকাল কমিটি তীব্র প্রতিবাদ জানায় ও ক্ষুব্ধ জনগণকে আন্দোলনে সামিল করে ২৮ অক্টোবর পাথরপ্রতিমা বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে ডেপুটেশন দেয়। কিন্তু ১ নভেম্বর থেকেই রামগঙ্গা-পাথরপ্রতিমা খেয়া ঘাটে ইজারাদার যাত্রীদের থেকে মাথা পিছু বর্ধিত নতুন পারানি মাশুল আদায় করতে থাকে। এসইউসিআই(সি) -র নেতৃত্বে যাত্রী কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা খেয়া ঘাটে বিক্ষোভ দেখায় এবং স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করে ও ১১ নভেম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে গণদরখাস্ত জমা দেয়। দীর্ঘ টালবাহানার পর পঞ্চায়েত সমিতি বর্ধিত ভাড়া রদ ও ব্লকের অন্যান্য খেয়ার বর্ধিত মাশুলও কমাতে বাধ্য হয়।

স্কুলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ব্লকের সেবাগ্রাম হাইস্কুলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সহ এক দুর্নীতিচক্র মিড-ডে মিলের চাল বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে। সবুজসাথীর সাইকেল, কন্যাশ্রীর টাকা পাইয়ে দেওয়া কিংবা একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নামেও অনৈতিকভাবে টাকা তোলা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্র-অভিভাবকরা সেবাগ্রাম হাইস্কুল ছাত্র-অভিভাবক দুর্নীতিবিরোধী কমিটি গড়ে তুলেছেন। ১৪ ডিসেম্বর কমিটি ১৩ দফা দাবিতে জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেয়। প্রভাবশালীদের নানা বাধা উপেক্ষা করে প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই দিন জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশনে উপস্থিত হয়। তিনি আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দেন আন্দোলনকারীদের।

ক্ষতিপূরণের দাবিতে কৃষিমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধান, আলু, সবজি সহ ফসলের ক্ষতি এবং রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় ঋণগ্রস্ত চাষিদের আত্মহত্যার প্রতিবাদে ২১ ডিসেম্বর সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালন করল অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন। ওই দিন সারা রাজ্যের পাশাপাশি বেলদা, কেশিয়াড়িতে মিছিল হয় এবং সরকারের কাছে কৃষিঋণ মকুব সহ ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিদের বিঘাপ্রতি ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ, বিনামূল্যে সার-বীজ সরবরাহ, ঋণমকুব, সারের কালোবাজরি রোধ প্রভৃতি দাবিতে সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ২২ ডিসেম্বর কৃষিমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেয়। রাজ্য কমিটির সদস্য দনা গোস্বামী এবং বিশ্বনাথ ঘোষ মন্ত্রীকে জানান, অকাল বর্ষণে রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলি, হাওড়া, বাঁকুড়া সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ধান ও আলুচাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ মহাজন থেকে অত্যন্ত চড়া সুদে ঋণ নিয়ে চাষ করায় আজ চাষিরা সর্বস্বান্ত, দিশেহারা। অবসাদগ্রস্ত হয়ে অনেকের অভাবিত অকাল প্রয়াণের খবরও আসছে। কৃষিমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেয় সারা বাংলা আলু চাষি সংগ্রাম কমিটি। নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী, প্রভঞ্জন জানা, প্রদীপ মল্লিক প্রমুখ। তাঁরা বলেন, ডিডিএ, এডিএ, কেপিএসদের মাধ্যমে সরেজমিন তদন্তসাপেক্ষে ধানের জন্য বিঘাপ্রতি ১৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর

২৩ ডিসেম্বর এআইকেকেএমএস আট দফা দাবিতে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। কিষানমাণ্ডিতে দালালরাজ বন্ধ করা, জানুয়ারির মধ্যে ধান কেনার কাজ শেষ করা, সারের কালোবাজারি বন্ধ করার দাবিতে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন দয়াল সিংহ, মোবাস্‌রা খাতুন, বিকাশ সিংহ, হারুন রশিদ, ইমরুল কায়েম প্রমুখ।

পূর্ব বর্ধমান

ডেউচা-পাঁচামি

একের পাতার পর

বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে ওই এলাকার নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সহমর্মিতা প্রকাশ করা প্রতিটি বিবেকবান মানুষের কর্তব্য হিসাবে এই সভা দৃঢ়ভাবে অভিমত ব্যক্ত করছে।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পর্যবেক্ষণে কয়েক বছর আগেই ধরা পড়েছিল, ডেউচা-পাঁচামি এলাকায় হিংলো, ভাঁড়কাটা এবং ডেউচা গ্রাম পঞ্চায়েতের দশটি মৌজা জুড়ে প্রায় ৩৪০০ একর জায়গায় ১২০০ ফুট মাটির নিচে রয়েছে অতি উন্নত মানের কয়লার এক সুবিশাল ভাণ্ডার। তার উপরের অংশে রয়েছে ব্যাসল্টের স্তর এবং সেটাও অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের। সংবাদে প্রকাশ, সম্পদের বিচারে এটি ভারতের বৃহত্তম এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ভাণ্ডার। বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটি পার্মিয়ান বা গন্ডোয়ানা কয়লা, প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে তৈরি। প্রকৃতিতে এটি বিটুমিনাস ধরনের। এর মোট পরিমাণ ২১০০ কোটি টন।

কনভেনশনের দাবি

১। দেওয়ানগঞ্জে নিরীহ গ্রামবাসী মহিলাদের ওপর বর্বরোচিত হামলায় জড়িত পুলিশ এবং সমাজবিরোধীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে,

২। আহতদের চিকিৎসার পরিপূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

৩। কয়লা খনির যে কোনও কাজ এখন বন্ধ সামগ্রিক বিষয়গুলি শুধু পছন্দমত ব্যক্তিবিশেষের কাছে নয়, জনগণের কাছে প্রকাশ্যে রাখতে হবে,

৪। প্রস্তাবিত কয়লা খনির ডিপিআর, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, ভূ-বিজ্ঞানী, খনি বিশেষজ্ঞদের মতামত জনসাধারণের কাছে শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশ করতে হবে,

৫। এলাকাবাসী এবং জনসাধারণের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে আবেগ ও উদ্বেগকে আঘাত করে বলপূর্বক জমি দখল করা চলবে না,

৬। হাজার হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করে খনি প্রকল্প চালু করা চলবে না।

বিপুল এই প্রাকৃতিক সম্পদ মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়ে দেশের মানুষের উন্নয়নের কাজে যদি সত্যিই ব্যবহার হয় তাতে মানুষের খুশি হওয়ার কথা। বিশেষত শিল্পে অনগ্রসর বীরভূম জেলাবাসী এবং তীব্র বেকার সমস্যায় জর্জরিত মানুষ এই এলাকায় বিজ্ঞান-নির্ভর পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন এবং উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহারে আশান্বিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

প্রশাসনের প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী গত ১১ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই কয়লা প্রকল্প চালু করার ঘোষণা করেন। ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত একটি প্যাকেজও ঘোষণা করেন। তিনি আশ্বস্ত করেন, জোর করে কারও জমি কেড়ে নেওয়া হবে না, আলোচনা করেই সব কাজ করা হবে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আলোচনা করে প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়ার কোনও সুস্পষ্ট, সদর্থক এবং কার্যকরী পদক্ষেপ কেউ দেখতে পায়নি। আলোচনার নামে, মূলত সরকারের সাথে নানা বিষয়ে সহমত পোষণ করেন, সরকারি দলের প্রতি অনুগত, এমন ব্যক্তিদের সাথেই প্রশাসন কিছু কথাবার্তা মাঝেমাঝে চালিয়েছে। এলাকার সম্ভাব্য প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মানুষদের সাথে প্রশাসন কথা বলার কোনও প্রয়োজন মনে করেনি। কেবল সরকারের অভ্যন্তরে পরিকল্পনা ছাড়া এ বিষয়ে কোনও বিশেষজ্ঞ মহলের সাথেও আলোচনা এবং তার ফল জনসমক্ষে জানানোর কোনও প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। সরকারি প্যাকেজের প্রতি যে ওখানকার মানুষ আদৌ আস্থাশীল নন, এ কথা প্রশাসন জানলেও তার সমাধান নিয়ে কোনও ভূমিকা তারা নেয়নি। ওখানে কয়েক শত পাথর খাদান এবং ক্রাশিং মেশিন আছে, যেখানে ওই এলাকা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করেন। যতদূর খবর পাওয়া গেছে ওই খাদান শ্রমিকদের ও কর্তৃপক্ষের সাথেও বিশেষ কোনও আলোচনা তাঁরা করেননি।

এই প্রকল্প হলে তার আনুষঙ্গিক সমস্যা এবং সরকার যে খোলামুখ খনির কথা বলছে, যা অত্যন্ত ক্ষতিকারক, তা উপলব্ধি করে ইতিমধ্যে মানুষ প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। এতে শুধু ওই প্রকল্পাধীন এলাকা নয়, প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার মানুষের স্বাস্থ্যের ভয়ঙ্কর সমস্যা দেখা দেবে, উর্বর জমি বন্ধ্যা হবে, ৩০৭ একর বনভূমি ধ্বংস হবে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য, জলবায়ুর সমস্যা দেখা দেবে— যা পরিবেশগত সমস্যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলে এলাকায় জনজীবন যে বিপন্ন হবে, তা নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক কোনও পদক্ষেপের কথা জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়নি। বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানী, স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদরা এ নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

সিউড়ি শহরে নাগরিক প্রতিবাদ সভা। ২৬ ডিসেম্বর

এই সভা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছে, প্রকল্প এলাকার সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং জনসাধারণের কাছে সমস্ত বিষয় খোলামেলা রাখার পরিবর্তে কত দ্রুত কয়লা প্রকল্পের কাজ শুরু করা যায় এবং ওখানকার মানুষকে উচ্ছেদ করা যায় সেই বিষয়ে সরকার এবং তার প্রশাসন খুবই তৎপর। শুধু তাই নয়, ওখানকার মানুষ যারা এই ধরনের সরকারি পদক্ষেপের বিরোধিতা করছেন তাদের হুমকি দেওয়া, থানায় নিয়ে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করা, মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো, ওখানকার লোকজনের ওপর পুলিশ ও সরকারি দলের লোকদের কড়া নজরদারি শুরু করা, তাদের এমনকি আত্মীয়দেরও গ্রামে আসা-যাওয়ার উপর নজরদারি চলতে থাকে। ওখানকার দশটি মৌজায় জরুরি প্রয়োজনেও জমি কেনাবেচা বন্ধ করে ধীরে ধীরে একটা ভয়ের বাতাবরণ এবং শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে।

সভা এ-ও লক্ষ্য করছে, মুখ্যমন্ত্রীর 'জোর করে জমি নেওয়া হবে না' এই ঘোষণা থেকে অতি দ্রুত সরে এসে জমি দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি শুরু হয়েছে। যা এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যই কার্যত হুমকি। গত ২৩ ডিসেম্বর হিংলো গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়ানগঞ্জে শাসক দলের পক্ষ থেকে লোকজন জড়ো করে খনির দাবিতে বিরাট মিছিল হয়। স্বভাবতই গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এলাকার মানুষজন, বিশেষত আদিবাসী মহিলারা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানান। তাদের তীব্র প্রতিবাদের ফলে মিছিল না করেই তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার পরপরই তারা ওইদিনই আবার সংঘবদ্ধ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে গ্রামবাসীদের ওপরে অতর্কিতে নির্বিচার আক্রমণ চালায়। লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় বিশেষত মহিলারা। শুধু তাই নয়, আহত মহিলাদের যাতে চিকিৎসা করাতে বাইরে না নিয়ে যেতে পারে, সেজন্য গ্রাম থেকে বেরোনোর রাস্তা পুলিশ এবং শাসক দল আশ্রিত সমাজবিরোধীরা অবরোধ করে রাখে। গ্রামবাসীরা অনেক ঘুরপথে দূরবর্তী মল্লারপুর হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা করাতে নিয়ে যেতে বাধ্য হন।

প্রতিবাদী এলাকাবাসীর উপর পুলিশ ও সমাজবিরোধী হামলার প্রতিবাদে সিউড়ি শহরে মিছিল। ২৫ ডিসেম্বর

সভা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চায়, মুখে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক উপায় ইত্যাদি গালভরা কথা বলে পূর্বের সরকারের মতোই এই সরকারও স্বৈরাচারী ভূমিকা গ্রহণ করছে। ডেউচা-পাঁচামি এলাকাতে জমি অধিগ্রহণ করার ক্ষেত্রে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়ের ছায়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শাসক বদলালেও দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপন্থার পরিবর্তন যে আদৌ ঘটেনি তা আবারও প্রমাণ হচ্ছে। মানুষকে বোঝানোর ঘোষণা বাস্তবে বর্তমানে প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে। সরকার কাজ হাসিল করার জন্য এলাকার মানুষকে লাঠি দিয়ে বোঝানোর ঘৃণিত পথ নিয়েছে। নাগরিক সভা নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর পুলিশ এবং দলীয় সমাজবিরোধীদের নির্বিচার এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছে। এই সভা দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে বলতে চায়, জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে যেকোনও আন্দোলন— তা দিল্লির উপকণ্ঠে দীর্ঘ এক বছর ধরে চলা কৃষক আন্দোলন হোক, কিংবা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনই হোক— শাসকের ভূমিকা একই এবং তা হল জোর-জবরদস্তি, আক্রমণ, নির্বিচারে অত্যাচার।

সভা দাবি জানায়, দেওয়ানগঞ্জে নিরীহ গ্রামবাসী মহিলাদের ওপর বর্বরোচিত হামলায় জড়িত পুলিশ এবং সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা, আহতদের চিকিৎসার পরিপূর্ণ দায়িত্ব সরকার এবং তার প্রশাসনকে নিতে হবে। কয়লা খনির যে কোনও কাজ এখন বন্ধ করে সামগ্রিক বিষয়গুলি শুধু পছন্দমতো ব্যক্তিবিশেষের কাছে নয়, জনগণের কাছে প্রকাশ্যে রাখতে হবে, প্রস্তাবিত কয়লা খনির ডিপিআর, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, ভূ-বিজ্ঞানী, খনি বিশেষজ্ঞদের মতামত জনসাধারণের কাছে শ্বেতপত্র আকারে উপস্থিত করতে হবে, এলাকাবাসী এবং জনসাধারণের জীবন জীবিকা সম্পর্কে আবেগ ও উদ্বেগকে যে কোনও ধরনের আঘাত করে জোর করে জমি দখল করে, হাজার হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করে খনি প্রকল্প চালু করা চলবে না।

এলাকাবাসী এবং জনগণের কাছে এই সভা আহ্বান করছে, দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলুন। সংগঠিত জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন যে কতটা শক্তিশালী হতে পারে তা ইতিহাস বারেবারে প্রমাণ করেছে। যত বড় স্বৈরাচারী শাসকই হোক, তার উদ্ধত মাথা যে নত করে দিতে পারে একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন— দিল্লির সফল কৃষক আন্দোলন তা আবারও প্রমাণ করল। এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে ডেউচা-পাঁচামি এলাকা সহ বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনস্বার্থে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবির ভিত্তিতে অবিচল দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য নাগরিক সভা সকলের কাছে আহ্বান করছে।

এই প্রস্তাবকে উপস্থিত নাগরিকরা সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন। এই আন্দোলন সঠিক পথে পরিচালনার জন্য একটি নাগরিক কমিটি গঠিত হয়।

রাজ্যেও কৃষক আত্মহত্যার মিছিল

চাষিদের বাঁচাতে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন চাই

পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আত্মহত্যার মর্মান্তিক ঘটনা একের পর এক ঘটেই চলেছে। কেউ জানে না এই নিরতিশয় মৃত্যুর ঘটনা আরও কত ঘটবে। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার ভোলানাথ বায়েন, বাঁকুড়ার কোতুলপুরের তাপস পাল, বর্ধমানের কালনার মানিক শেখ, রায়নার জয়দেব ঘোষ, বনতি গ্রামের গণেশ নারায়ণ ঘোষ, গলসির লিয়াকত আলি প্রমুখের অসহায় আত্মহত্যা এই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাণশক্তি অন্নদাতা কৃষক সমাজ আজ পুঁজিবাদের নিষ্ঠুর যাঁতাকলে যে নির্মম যন্ত্রণায় ছটফট করছে তা ইচ্ছে করে চোখ বুজে না থাকলে যে কারোরই বুকে তোলপাড় তুলতে বাধ্য। দেশের মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্ন আজও কৃষিনির্ভর। বিজ্ঞানের বিপুল আবিষ্কারকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর সুযোগ এবং তার ভিত্তিতে জীবনমানের উন্নয়নের সুযোগ বাস্তবে কৃষকদের হাতে নেই। তা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার কোনও বিকল্প না থাকায় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কৃষকরা খাদ্যশস্য উৎপাদন করে চলেছে। সেই কৃষি কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতাসীন সরকারগুলির সহযোগিতায় কর্পোরেট দুনিয়ার হাতে পড়ে আজ চূড়ান্ত অলাভজনক। তাই সামন্ততান্ত্রিক যুগের মতো এ যুগের নব্য সুদখোর মহাজনী ব্যবস্থার অক্টোপাসে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছে কৃষক সমাজ। নিত্যনতুন সরকারি ও কর্পোরেট আক্রমণের শিকার হচ্ছে কোটি কোটি কৃষক।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ দেশে প্রতি ১২ মিনিটে একজন কৃষক আত্মহত্যা করছে। কেবল ২০১৯ সালেই সংখ্যাটা ৪২ হাজারের বেশি। গত ১৫ বছরে ৫ লক্ষের বেশি কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে মূলত ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে। এই গণ-আত্মহত্যার মিছিল রোধ করবার জন্য এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে সরকার ও ধনকুবেরদেরকে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়েছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবার দিল্লির উপকণ্ঠে ঐতিহাসিক ধর্নার মাধ্যমে।

রাজ্যের সাম্প্রতিক কৃষক আত্মহত্যার ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে বিপুল ঋণ করে ফলানো ধান এবং আলু প্রবল বৃষ্টি এবং মারাত্মক পোকার আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায়। প্রবল বৃষ্টিতে এবছর বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় আমন ধানের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। সে ধাক্কা সামলে অনেকেই আবার অনেক খরচ করে চাষ করেছিলেন। এ বছর একেবারে শেষ মুহূর্তে শোষক পোকার আক্রমণে সমস্ত ফসল কার্যত মাঠেই শেষ হয়ে গেছে। বিপুল দামে কীটনাশক সংগ্রহ করে একে রোধ করা কার্যত ধান চাষিদের হাতের বাইরে থেকে গেল। ফসল মার খেল তার সাথে উৎপন্ন ফসলের দাম ফেলে দিয়ে ফাটকাবাজ ধানকলের মালিকরা অতি সস্তায় ধান বিক্রি করতে বাধ্য করছে চাষিদের। ধানের গুণমান খারাপের অজুহাতে কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ১০ কেজি ধান লুটে নিচ্ছে তারা। কোথায় সরকারি কিসান মান্ডি? সে কেবল প্রচারেই আছে। সব মিলে দিশেহারা অবস্থা।

দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় আলু চাষ মুখ্য অর্থকরী ফসল। বৃষ্টিতে এবছর আলু চাষের মাঠ ডুবে গিয়ে লক্ষ লক্ষ পরিবারে হাহাকারের রোল উঠেছে। এক বিঘা আলু চাষ করতে খরচ হয় সার, বীজ, কীটনাশক, সেচের জলে এবং মজুরি ইত্যাদি মিলে গড়ে ২৭ হাজার টাকা। প্রকৃতি সহায় হলে ফলন হয় সর্বোচ্চ ৪০ কুইন্টাল। উৎপাদন ব্যয় দাঁড়ায় ৬ টাকা ৭৫ পয়সা প্রতি কেজি। এর উপরে নির্ভর করে চাষি পরিবারকে সারা বছর বেঁচে থাকতে হলে আলু চাষির দাম পাওয়া উচিত কমপক্ষে ৮ টাকা কেজি। কিন্তু বাস্তবে চাষি পেয়ে এসেছে ২ টাকা থেকে ৪ টাকা কেজি দর। সরকারি সহায়তায় কোল্ড স্টোরেজের মালিক এবং ফাটকাবাজদের কেরামতিতে সাধারণ মানুষকে সেই আলু বাজারে কিনতে হচ্ছে চার থেকে ছয় গুণ দাম দিয়ে। এ বছর চাষের জন্য পুরো ব্যয়টাই মার গেল বৃষ্টিতে ডুবে গিয়ে। তারপরেও নিরুপায় চাষি আবারও ধার করে কমপক্ষে ১৫ হাজার টাকা বিঘা পিছু ওই জমিতে ঢেলে আলু চাষে নামছে। হাঙ্গরের হাঁ নিয়ে ওঁত পেতে আছে সার বীজ কীটনাশকের কর্পোরেট কোম্পানিগুলি। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার কয়েক বছর আগেই সারে ভর্তুকি বাতিল করে এম আর পি অর্থাৎ খুচরো দামের সর্বোচ্চ মাত্রা বস্তার উপর ছাপানোর এতকালের নিয়ম তুলে দিয়েছে। এখন কোম্পানিগুলো ইচ্ছেমতো দাম বস্তার উপর ছেপে দেয়। এ বছর কোনও কিছুর পরোয়া না করে যেমন খুশি দামে সার কিনতে বাধ্য করছে তারা। লেখা আছে ১৪০০ টাকা, বাস্তবে কিনতে বাধ্য করছে চাষিদের কম করে ২২০০ টাকায়। আলু বীজ-চাষির হাত থেকে কোম্পানির হাতে চলে গিয়েছে বহুদিন আগে। এবছর ১৪০০ টাকা দামের বীজ কিনতে বাধ্য করা হয়েছে ৩০০০-৪০০০ টাকাতে সর্বত্র কৃত্রিম অভাবের প্রচার করে। শীতের সবজি চাষকে নির্ভর করে বেঁচে থাকে অসংখ্য পরিবার। এই বর্ষায় তাদেরও সব শেষ হয়ে গেল। এতকিছু ঝুঁকি নিয়ে নিরুপায় চাষির প্রায় সন্তানের মতো যে চাষ তার চোখের সামনে সব শেষ হয়ে যেতে দেখে আর বুক বাঁধবার মতো ভরসা কার উপরে রাখতে পারে চাষি?

সরকারের ভূমিকা এক কথায় অত্যন্ত নিষ্ঠুর। একের পর এক অসহায় চাষি আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে, আর সরকারি কর্তাব্যক্তিদের বক্তব্য— এ মৃত্যু চাষের ক্ষতির জন্য নয়, অন্য কোনও কারণে। অর্থাৎ সরকারের এতে কোনও দায় নেই। বর্ধমান জেলার যে রায়নায় কয়েকদিন আগে জয়দেব ঘোষ আত্মহত্যা করেছেন সেই রায়নারই বাসিন্দা রাজ্যের মুখ্য কৃষি উপদেষ্টা তথা তৃণমূল বিধায়ক প্রদীপ মজুমদারের বক্তব্য, 'চাষে ক্ষতির জন্য মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই। নিখরচায় বিমা করে দেওয়া হচ্ছে। সাত দিন আগেও কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি এক গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন, আলু চাষের ক্ষতি নির্ধারণই হয়নি। আগে থেকে কী করে বলা সম্ভব চাষের ক্ষতির জন্যই কেউ আত্মঘাতী হয়েছেন? (আনন্দবাজার,১৯.১২.২১)। সত্যিই তো! সরকার ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্ধারণ করেনি, চাষি কী করে বুঝবে তার ওই জলে ডুবে যাওয়া আলু চাষ আগামী দিনে ফসল দেবে, নাকি নষ্ট হবে? কী গুরুতর এই প্রশ্ন তাঁর মাথায় ধাক্কা দিয়েছে! এই হল আমাদের সরকারি মুখ্য কৃষি উপদেষ্টা! আরও পরিষ্কার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি এ রাজ্যে চাষের কারণে কোনও চাষির মৃত্যু হয় না। তিনি বলেন, খরিফ (এপ্রিল থেকে আগস্ট) এবং রবি ও বোরো (নভেম্বর থেকে মার্চ) মরসুমের শুরুতেই চাষি থেকে ভাগচাষিরা কৃষকবন্ধু প্রকল্পে সাহায্য পান। কিসান ক্রেডিট কার্ড থেকেও চাষিরা কম সুদে ঋণ পান (আনন্দবাজার পত্রিকা-২০.১২.২১)। মুখ্য কৃষি উপদেষ্টা এবং মন্ত্রী উভয়েই যখন বলছেন অতএব এই টপটপ করে মানুষগুলির একের পর এক আত্মহননের ঘটনা কোনওমতেই চাষের জন্য যে হতে পারে না এটা আমাদের মেনে নিতেই হবে! আশ্চর্যজনক হলেও এ কথা সত্য, এঁরাই আমাদের দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেজে বসে আছেন। জনসাধারণের ট্যাক্সে লালিত-পালিত এরা জনসাধারণের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ববোধ ঝেড়ে ফেলার জন্য একেবারে নির্লজ্জ অসত্য কথা বলতে কত নির্মম হতে পারে!

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের বিপুল ক্ষতি পূরণ করার দাবিতে এআইকেকেএমএস-এর প্রতিবাদ দিবস। ২১ ডিসেম্বর, বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

এমআরপি নির্ধারণ, সারের দামে কালোবাজারি বন্ধ প্রভৃতি দাবিতে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে এআইকেকেএমএস-এর বিক্ষোভ।

সব সময় দেখা গেছে, যারা যখন সরকারে থাকে তারা এভাবেই সত্যকে পাশ কাটিয়ে যায়। তারাই যখন বিরোধী শিবিরে যায় তখন কৃষক আত্মহত্যা নিয়ে সরকারকে দায়ী করতে থাকে। সংবাদে প্রকাশ, সিপিএমের কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার দাবি করেছেন, তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যের ২৪৬ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। অথচ সিপিএম সরকারের আমলে আলুচাষি, ধানচাষি, পাটচাষি, লংকা চাষিদের আত্মহত্যার একটি ঘটনাকেও তারা স্বীকার করেনি। ক্ষমতাসীন তৃণমূলের ভাষাতেই তারা পারিবারিক কলহ কিংবা অন্য কিছুকে দায়ী করে পাশ কাটিয়ে গেছে। এদের মিল এখানে। সত্য স্বীকার করলে দলে দলে এই বেঘোরে মৃত্যুর মূল কারণ যে কর্পোরেট তোষণ নীতি তা প্রকাশ্যে এসে যাবে। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা যে কোনও কারণে নষ্ট হওয়া ফসলের ক্ষতিপূরণের দায়ভার সরকারকে নিতে হবে। তৃতীয়ত কৃষিঋণ মকুবের প্রশ্ন আসবে। সাথে যুক্ত হবে মৃতের পরিবারকে দেয় ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব ইত্যাদি। সর্বোপরি সামনে উঠে আসবে সভ্যতার এই অগ্রগতির যুগে পরিশ্রম করে ফসল ফলানো সত্ত্বেও অন্নদাতাকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সরকারের চরম ব্যর্থতার প্রশ্নটি।

তাই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অস্বীকারের এত বাহানা। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারেরও একই চরিত্র। টানা এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা কৃষক আন্দোলনে ৭০০-র বেশি কৃষকের মৃত্যুকে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার দেখেও দেখতে পায়নি। এই সরকারগুলি কর্পোরেটদের বেলায় কিন্তু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করে চলেছে। দেশের টাকা লুটে নিয়ে বিদেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করছে। তাই এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক যে, এ দেশের সরকারগুলি জনসাধারণের জন্য নাকি দেশি-বিদেশি কর্পোরেটদের জন্য?

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের মধ্য থেকে আওয়াজ উঠেছিল— আত্মহত্যা নয়, লড়াই করে প্রয়োজনে জীবন দেব আমরা। আমাদের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত সম্পদ কর্পোরেটের লুঠের জন্য নয়, বাঁচার মতো উপযুক্ত শ্রমের মূল্য দিতে হবে, জনবিরোধী সমস্ত প্রকার সরকারি নীতি প্রত্যাহার করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার অনড় থেকে কৃষকদের হতাশ করে ঘরে ফেরাতে চেয়েছিল। কিন্তু কৃষকরাই সরকারকে নতিস্বীকার করতে বাধ্য করেছে। এই শিক্ষাকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরাও জেলায় জেলায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছে। দাবি উঠেছে, আর একটিও মৃত্যু নয়, অবিলম্বে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ, কৃষিঋণ ও বিদ্যুতের বিল মকুব, বিনামূল্যে বীজ সার কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ এবং অসহায় আত্মহত্যাকারীদের পরিবারবর্গকে অবিলম্বে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

বিএসএনএল কর্মীদের বিক্ষোভ

বিএসএনএল কলকাতা সার্কেলের প্রায় ৪ হাজার ঠিকা শ্রমিক এক বছরের বেশি কর্মচ্যুত হয়ে আছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী লকডাউনের সময়ের বেতন এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে বসে যাওয়া বিএসএনএল কর্মীদের কেউ অভাবে অনটনে মারা গেছেন, কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন।

বিএসএনএল বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে জেসিএল প্রথায় কর্মরত বিএসএনএল ঠিকা শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল, লকডাউনের সময়ের বেতন, মৃত জেসিএল শ্রমিকদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও ইপিএফ-ইএসআই বকেয়া টাকা জমা দেওয়ার দাবিতে ১৫ ডিসেম্বর সাউথ জিএম বালিগঞ্জ অফিসে ধরনা বিক্ষোভ দেখান শতাধিক জেসিএল শ্রমিক। সভায় বক্তব্য রাখেন মনোজ ঠাকুর, তাপস জানা, অমিতা বাগ প্রমুখ। কমিটির পক্ষ থেকে সাউথ জিএম-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কমিটির আহ্বায়ক অনিন্দ্য রায়চৌধুরী, মনোজ ঠাকুর ও অমিতা বাগ এবং অন্যতম কার্যকরী সদস্য মনোজিত চক্রবর্তী ও উজ্জ্বল চ্যাটার্জী প্রতিনিধি ডেপুটেশনে যান।

দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানান, শ্রমিকদের লকডাউন সময়ের বেতন যাতে দ্রুত মেটানো যায়, সেই বিল কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠানো হয়েছে। দিল্লি থেকে অনুমোদন এলেই ওই তিন মাসের বেতন দেওয়া হবে। তিনি শ্রমিকদের অন্যান্য দাবিগুলিও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরবেন বলে জানান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গীতার মাহাত্ম্য প্রচার কী উদ্দেশ্যে?

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ছাত্ররা গীতা পাঠ বাদ দিয়ে ফুটবল খেলুক। এতে দেহ মন সবল হবে। সেই বিবেকবাণীকে উপেক্ষা করে সম্প্রতি হাওড়ার শিবপুরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (আইআইইএসটি) দেখা গেল উলটপুরাণ। প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের অন্তর্ভুক্তির অনুষ্ঠানে গীতা ও হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতে দেখা গেল। এর কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? প্রশ্ন তুলেছে হাওড়া জেলা সেভ এডুকেশন কমিটি। কমিটির বক্তব্য, গীতার বাণী যারা ধারণ করতে চান, করুন ব্যক্তিগত পরিসরে। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে তা কেন?

২০ ডিসেম্বর ইনস্টিটিউটের মেইন গেটে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদপত্র দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সভায় কমিটির সম্পাদক প্রবীণ শিক্ষক চণ্ডীচরণ মাইতি বলেন, যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাঠ নিতে এসেছে সেখানে গীতার মাহাত্ম্য প্রচার আসলে প্রযুক্তি ও অধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী চিন্তাভাবনার পথকে প্রশস্ত করা। বিজেপি সরকারের শিক্ষানীতির অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার গৈরিকীকরণ করা। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি এর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন পরিচালনা করছে। শিবপুর আইআইইএসটি-তে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এই শিক্ষানীতিরই একটি অঙ্গ।

বঞ্চিত ট্যাক্স কালেক্টররা লাগাতার আন্দোলনে

ট্যাক্স কালেক্টররা এতদিন পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে যে রেজিস্ট্রেশন ফি আদায় করতেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশে তা অনলাইনে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে মাত্র ৭৫০ টাকা ভাতা এবং নামমাত্র কমিশনের ওপর নির্ভরশীল রাজ্যের প্রায় ৪ হাজার ট্যাক্স কালেক্টর কাজ হারানোর মুখে।

প্রতিবাদে ২২ নভেম্বর রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত ট্যাক্স কালেক্টররা পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্বে সল্টলেকে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে বিক্ষোভ দেখিয়ে দাবিপত্র পেশ করেন। তাঁদের দাবি— স্থায়ী নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ১০ হাজার টাকা ভাতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের রেজিস্ট্রেশন ফি আদায়ের অধিকার বজায় রাখা, অবসরপ্রাপ্ত ট্যাক্স কালেক্টরদের পেনশন ও ৫ লক্ষ টাকা অনুদান দিতে হবে, জিপি কর্মী পদে নিয়োগ করতে হবে, ট্যাক্স কালেক্টরদের সরকারি কর্মীর মর্যাদা দিতে হবে। এ দিন পুলিশ মিছিল করতে বাধা দেয় ও সংগঠনের সভাপতি কমরেড সুনির্মল দাস সহ ৬৯ জনকে গ্রেপ্তার করে।

ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত ডাইরেক্টরেটের কমিশনার ও জেলা আধিকারিকদের পক্ষ থেকে ট্যাক্স কালেক্টরদের সম্পর্কে নানা তথ্যাদি সংগ্রহের নির্দেশ জারি হয়েছে। এটা আন্দোলনের এক ধাপ জয়। ৫ ডিসেম্বর সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি সংবলিত গণ পোস্টকার্ড পাঠানো হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে স্মারকলিপি নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের

এনআইওএইচ বাঁচাও কমিটি এবং নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে স্মারকলিপি দেওয়া হল ২৪ ডিসেম্বর। মন্ত্রী কলকাতার এই প্রতিবন্ধী চিকিৎসা কেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠানে এলে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আহ্বায়ক প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবিপত্র দেন।

ডাক্তার তরুণ মণ্ডল ওই দিন এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব ভারতের প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা ও স্বাধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে সমাজের বিশিষ্টজন, প্রতিবন্ধী ভাই-বোন ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে নিয়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার চাপে সরকার পিছু হঠলেও ১৬ আগস্ট দেওয়া মূল নির্দেশটি বাতিল বলে এখনও ঘোষণা করেনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আশ্বাস দেন এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হবে না এবং মানোন্নয়ন ঘটানো হবে।

তবে গত ১৬ আগস্টের অর্ডার প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি সেই বিষয়ে সদর্থক কোনও উত্তর দেননি। ডাক্তার মণ্ডল বলেন, ১৬ আগস্টের অর্ডার বাতিল করে নতুন অর্ডার জারি না করা পর্যন্ত আন্দোলন বজায় থাকবে।

জম্মু-কাশ্মীরে বিদ্যুৎ শিল্পে নজিরবিহীন ধর্মঘট

বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার পরিচালিত জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন আন্দোলনের চাপে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হল। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিদ্যুৎক্ষেত্র বেসরকারিকরণ করতে একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার গড়ে তুলবে। জম্মু-কাশ্মীর পাওয়ার ট্রান্সমিশন কোম্পানি এবং পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেডকে নিয়ে এই জয়েন্ট ভেঞ্চার গড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছিল।

এই সিদ্ধান্তের ফলে একদিকে বিদ্যুৎক্ষেত্রে সার্বিক বেসরকারিকরণ করা হবে, অন্যদিকে শ্রমিক কর্মচারীদের জীবনে ছাঁটাইয়ের খড়্গ নেমে আসবে এবং বিদ্যুতের দাম আরও বেশি হারে বাড়বে। এটা উপলব্ধি করেই বিদ্যুৎক্ষেত্রের কর্মচারীরা আন্দোলনে নামে। জয়েন্ট ফোরাম অব জম্মু-কাশ্মীর ইলেক্ট্রিসিটি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১৭ ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটের ডাক দেয়। ১৮ ডিসেম্বর শ্রীনগর হয়ে পড়ে বিদ্যুৎবিহীন। আন্দোলন ভাঙতে গভীর রাতে আন্দোলনের নেতাদের বাড়ি বাড়ি হানা দেয় পুলিশ। ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব ইলেকট্রিসিটি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ (এন সি সি ও ই ই ই) হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে, একজন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হলে সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে। পরের দিন প্রশাসনের আহ্বানে মিলিটারি নামে। তবুও ধর্মঘট ভাঙতে ব্যর্থ হয়। সাধারণ মানুষও ব্যাপকভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন করে। আন্দোলনের এই শক্তিবৃদ্ধি লক্ষ করে এবং দিল্লির কৃষক আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে অবশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সামনে মাথা নত করতে সরকার বাধ্য হয় এবং বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ঘোষণা করে।

কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ২১ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন। অভিনন্দন জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় কনভেনর অনাভরথন, প্রদীপ আর বি এবং সুব্রত বিশ্বাস ২৩ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছেন, আন্দোলনের এই জয় বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এবং তার সংশোধনী বিল ২০২১-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com